গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৯ সংখ্যা | ৯ - ১৫ এপ্রিল ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ কমানোর সিদ্ধান্ত

জনস্বার্থের তোয়াক্কাই করছে না বিজেপি সরকার

দেশের গরিব, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার আরও একটি নজির তৈরি করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ১ এপ্রিল থেকে নতুন অর্থবর্ষ শুরুর আগের রাতে হঠাৎই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এক নির্দেশিকা জারি করে স্বল্প সঞ্চয়ের উপর থেকে এক ধাক্কায় ১১০ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত সুদের হার কমানোর ঘোষণা করে দিল এবং দেশজুড়ে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় দফা ভোটের দিন প্রবল জনঅসন্তোষের আশঙ্কা করে পরের দিনই তড়িঘড়ি আবার তা তুলে নেওয়া হল। সরকারের ঘোষিত নির্দেশিকা অনুযায়ী সুদ কমানোর কথা বলা হয় ১-৫ বছরের মেয়াদি আমানত, ৫ বছরের রেকারিং ডিপোজিট, মাসিক আয় প্রকল্প, এনএসসি, কিসান বিকাশপত্র, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মতো সব প্রকল্পেই। উল্লেখ্য, স্বল্প সঞ্চয়ের সুদের হার গত বেশ কয়েক বছর ধরেই সরকার কমিয়ে চলেছে। এ বার এক ধাক্কায় অনেকখানি কমাতে চলেছে সরকার।

নির্দেশিকাটি জানতে পেরেই পরদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে। গরিব, নিম্নবিত্ত, স্বল্প আয়ের মানুষেরাই মূলত স্বল্প সঞ্চয়ে টাকা জমা রাখেন। অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের বড় অংশ সারা জীবনের সঞ্চয়ের উপর এই সুদ থেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এমনিতেই লকডাউনের কারণে বিরাট অংশের মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে গিয়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে লাফিয়ে। পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের দাম বিজেপি সরকার বাড়িয়েই চলেছে। লাফিয়ে বাড়ছে ওষুধের দাম এবং চিকিৎসার খরচ। এই অবস্থায় স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার কমিয়ে বিজেপি সরকার জনসাধারণের জীবনের ভাল-মন্দ সম্পর্কে

দুয়ের পাতায় দেখুন

চাকরি দিতে পারবেন না, মানলেন অমিত শাহ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অবশেষে স্বীকার করলেন, তাঁরা চাকরি দিতে পারবেন না। সে জন্য ক্ষমতায় এলে অলীক রোজগারের স্বপ্ন দেখালেন। আনন্দবাজারে (৩০ মার্চ, '২১) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

শাহরা বলছেন, তাঁরাই বাংলায় আসল পরিবর্তন আনবেন। সেই আসল পরিবর্তনের রূপটি কেমন, টুকরো কথায় তার কিছু ইঙ্গিতও দিয়েছেন সাক্ষাৎকারে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে চাকরির দিশা কোথায়? উত্তরে অমিত শাহ বলেছেন, 'বাংলায় এক কোটি রোজগার' হবে। রোজগার মানে কি চাকরি? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'রোজগার মানে চাকরি নয়'। তা হলে সেটা কী বস্তু? অমিত শাহ তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলেননি।

দুয়ের পাতায় দেখুন

জয়নগরে বিশাল নির্বাচনী জনসভা

জয়নগর কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড তরুণ নস্করের সমর্থনে বিশাল জনসভা। ২ এপ্রিল

ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম আন্দোলনে কালি ছেটাতে পারবে না ভোটবাজেরা

এতদিন নন্দীগ্রাম নিয়ে মুখ খোলার উপায় ছিল না সিপিএম নেতৃত্বের। কিন্তু সেই সুযোগ তাদের করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি নন্দীগ্রামে ভোট প্রচারে গিয়ে তাঁর দলের প্রাক্তন নেতা এবং বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কিছু অর্থহীন কথা বলতেই তাকে লুফে নিয়েছে সিপিএম। সঙ্গে সঙ্গে আসরে নেমে পড়েছেন দীর্ঘদিন প্রচারের আলোর বাইরে থাকা নন্দীগ্রামের গণহত্যার জন্য জনতার আদালতে প্রধান অভিযুক্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য। তিনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনটাকেই একটা 'কুটিল চিত্রনাট্য' বলে দেগে দিয়েছেন।

একবার পিছন ফিরে দেখা যাক, সেদিন কী হয়েছিল? ২০০৬-এর শেষ ভাগেই ১৯ হাজার একরেরও বেশি জমি ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবের জন্য অধিগ্রহণের নোটিশ দিয়েছিল সিপিএম সরকার। সেই সময় থেকেই শুরু হয় স্থানীয় কৃষকদের প্রতিবাদ আন্দোলন। গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে আন্দোলনের কমিটি। প্রচারের আলোর বাইরে থেকে কমিটি গঠনের কাজে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। আন্দোলন ধীরে ধীরে গতি পেতে থাকে। এই আন্দোলনকে হুমকি দিয়ে পুলিশ দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় সিপিএম সরকার। সিপিএম দল সেই সময় কুখ্যাত সালেম গোষ্ঠীর হয়ে পুরোপুরি নির্লজ্জ দালালি শুরু করে। তারা নন্দীগ্রামের আন্দোলন ভাঙার জন্য বিপুল অস্ত্রশস্ত্র সহ দুষ্কৃতী বাহিনীকে জড়ো করতে থাকে। খেজুরি এবং নন্দীগ্রাম সংলগ্ন কিছু এলাকায় তারা সশস্ত্র ক্যাম্প তৈরি করেছিল। ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি জমি অধিগ্রহণের নোটিশ পড়তেই পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পুলিশ লাঠি-গুলি চালায়। জনগণের প্রতিরোধে পুলিশ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ৭ জানুয়ারি ভোর রাতে সিপিএম দুষ্কৃতী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান আন্দোলনের সমর্থক সেলিম, ভরত, বিশ্বজিৎ। কিন্তু গ্রামবাসীদের তীব্র প্রতিরোধে সিপিএম এলাকার দখল নিতে পারেনি। এই ঘটনার পরে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রাম কমিটিগুলি

পাঁচের পাতায় দেখুন

মোদির 'ডাবল ইঞ্জিন' পিষে দিচ্ছে জনগণকে

ভোটে জিততে মরিয়া নরেন্দ্র মোদি প্রায় প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন। প্রতিটি সভাতেই তিনি 'ডাবল ইঞ্জিন' অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার গড়ার ঢাক পেটাচ্ছেন। তাতে নাকি উন্নয়নের রথ বিপুল গতিতে চলবে, সমৃদ্ধির বান ডাকবে রাজ্যবাসীর জীবনে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি সরকার। প্রধানমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, ডাবল ইঞ্জিনের জোরে কেমন চলছে সে সব রাজ্য? একবার দেখে নেওয়া যাক।

উত্তরপ্রদেশ

বেকারি ও ছাঁটাই

- সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮-র তুলনায় দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার এই রাজ্যটিতে বেকারত্বের হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।
- রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই গত বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় জানিয়েছেন, আগের দু'বছরে সাড়ে ১২ লক্ষ বেড়ে উত্তরপ্রদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পৌঁছে গেছে ৩৪ লাখে (বিজনেস টুডে, ২৭-৩-২০)।

ছয়ের পাতায় দেখুন

চাকরি দিতে পারবেন না

একের পাতার পর

তা হলে রোজগারটা কোন পথে আসবে? হতে পারে সরকার ছোটখাটো ব্যবসা করার জন্য কিছু ঋণ দিল, যাকে বলে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প। কিন্তু এই জাতীয় প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে তো আছেই। সিপিএম আমলে এই স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কতজনকে সর্বস্বান্ত হয়ে পুলিশি জুলুমের শিকার হতে হয়েছে, তা ভুক্তভোগীরা জানেন। তৃণমূলের আমলেও ওই প্রকল্পগুলি চলছে। কিন্তু তার দ্বারা তো বেকার সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হয়নি! এই জাতীয় রোজগার প্রকল্প নাম পাল্টে আনা হলে সেটা কি আসল পরিবর্তনকে সূচিত করে?

আর কোন পথে রোজগার হতে পারে— কেন্দ্র থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে? আপনি ভাবতে পারেন, মন্দ কী! কিন্তু বাস্তব কী বলছে? তিন চার বছর আগেও গ্যাসে ভরতুকি মিলত দুশো-আড়াইশো টাকা করে। এখন তা কমতে কমতে ১৯ টাকায় ঠেকেছে। রেশনে বরাদ্দ কমছে, বাড়ছে দাম। জনকল্যাণমূলক খাতে ভরতুকি কমতে কমতে বন্ধের পথে। তা হলে রোজগার কোন পথে আসবে? রোজগার কিছুটা হতে পারে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে। সেটাও ধুঁকতে ধুঁকতে চালু আছে। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প বাড়িয়ে ২০০ দিনের করা এবং তাতে বেতন বাড়ানোর দাবি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অস্বীকার করে চলেছে। তা হলে এক কোটি রোজগারের প্রতিশ্রুতিও কি নোট বাতিলের সময় অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো নির্বাচনী জুমলা?

শাহ আরও বলেছেন, পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন। পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হলে পাটজাত পণ্যের বাজার তৈরি করতে হবে। কিন্তু এর সামনে প্রধান বাধা হল সিন্থেটিক লবি। শিল্পপতি আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চাপে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্যাকেজিং-এর কাজে সিন্থেটিক বস্তার ব্যবহার বাড়িয়েই চলেছে। আগে চটের বস্তা ব্যবহারের যে বাধ্যবাধকতা ছিল সেটা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দিয়েছে। ফলে চটের বস্তার ব্যবহার ক্রমাগত কমছে। তা হলে পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটবে কী করে? পাটশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটালে কৃষকরাও পাটের দাম পেত। জেসিআইকে কেন্দ্রীয় সরকার পাট কিনতে নামালে ফড়েদের খপ্পর থেকে চাষিরা কিছুটা বাঁচতে পারত, অভাবি বিক্রির হাত থেকে বাঁচত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পাট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জেসিআইকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। এই অবস্থায় পাটের বস্তার ব্যবহার আবশ্যিক করার আইন না আনলে এই প্রতিশ্রুতিও ভাঁওতা হতে বাধ্য।

শিল্পের প্রশ্নে কী বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? বলেছেন সাতটা শিল্প পার্ক হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি তো নতুন নয়। বিজেপি শাসিত নানা রাজ্যে এমন 'পার্ক' বানিয়েছেন অমিত শাহরা। পশ্চিমবঙ্গেও সিপিএম আমল থেকে তৃণমূল আমল— কত শিল্প পার্ক হয়েছে রাজ্যে! সেখানে গবাদি পশুরা ঘাস খায়। শিল্প কোথায়?

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যে বড়, ছোট, মাঝারি শিল্প করতে হবে। শিল্পের জন্য জল প্রয়োজন। বলেছেন গুজরাটে ১২০০ ফুট নিচে জল, আর বাংলায় ৬০ ফুট নিচে। প্রশ্ন হল, শিল্পের সামনে সঙ্কট কি জল? কেউ বলেনি সঙ্কট জলের। মূল সঙ্কট ক্রয়ক্ষমতার, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখই করলেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটাও বললেন না, সিঙ্গুর থেকে গুজরাটের সানন্দে গিয়ে ন্যানো কারখানা বন্ধ হল কেন? দিল্লি-গুজরাত ডবল ইঞ্জিন সরকার হওয়া সত্ত্বেও একটা ন্যানো কারখানা বাঁচাতে পারল না কেন?

এরপর কী পড়ে থাকল? প্রধানমন্ত্রী কথিত পকোড়া এবং মুখ্যমন্ত্রী কথিত তেলেভাজা শিল্প, চপ শিল্প। বিজেপি কি এরই নতুন সংস্করণ বের করবে? তা হলে রোজগার কোন পথে? ভিক্ষাবৃত্তি, অভাবের তাড়নায় অভুক্ত সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে অন্ধকারে জননীর রাস্তায় দাঁড়ানো? অমিত শাহদের সোনার রাজত্বে দেশে বেকারির হার ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। ফলে রোজগার নিয়ে আর কত ধানাই-পানাই করবেন মিথ্যা ভাষণের গুরুমশাই? চাকরির বদলে 'রোজগার' আসলে দুধের বদলে পিটুলি গোলা জল।

জনস্বার্থের তোয়াক্কাই করছে না

একের পাতার পর

কতখানি বেপরোয়া— এই সিদ্ধান্তে সেই মনোভাবটিকেই স্পষ্ট করে দিল।

কিন্তু নির্দেশিকাটি জারি করে মুশকিলে পড়ে গেলেন বিজেপি নেতারা, কারণ পাঁচটি রাজ্যে ভোট চলছে। ১ তারিখেই ছিল পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় দফা ভোট। এমনিতেই পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের দাম বাড়ার কারণে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে। কৃষিনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে কৃষকরা। এই অবস্থায় বিজেপি নেতারা আর সুদ কমানোর ঝুঁকি সওয়ার মতো অবস্থায় নেই। বিজেপির অন্দরমহলে 'থামাও থামাও' রব— যা হবে ভোটের পরে, এখন নয়। এরই ফল পর দিনের অর্থমন্ত্রীর টুইট— "পিপিএফ সহ স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ কমছে না। জানুয়ারি থেকে মার্চে যে সুদ মিলছিল, আপাতত তা-ই পাওয়া যাবে।"

নির্দেশিকাটি জারি হয়ে গিয়েছিল না হয় ভুল করে, কিন্তু নির্দেশিকাটি তো ভুল নয়। এমন নির্দেশিকা তো কেউ ভুল করে তৈরি করে ফেলতে পারে না। সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, সব স্তরে আলোচনা করে মোদি সরকারের শীর্ষ স্তরের অনুমোদনের ভিত্তিতেই নতুন সুদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয় এবং এবারও তাই হয়েছে। কোনও কারণে নির্দেশিকাটি শুধু অসময়ে বেরিয়ে পড়েছে!

যে সিদ্ধান্তের সাথে সাধারণ মানুষের, গরিব মানুষের স্বার্থ জড়িত তা কি সত্যিই মন্ত্রীদের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারে? সত্যিই যদি নজর এড়িয়ে বেরিয়ে যায় তবে তার জন্য কে বা কারা দায়ী তা তাঁরা দেশের মানুষকে জানাচ্ছেন না কেন? বাস্তবে এই নির্দেশিকা জারি যে কোনও নজর এড়ানোর ব্যাপার নয়, তা প্রত্যাহারের নির্দেশিকায় 'আপাতত' কথাটির ব্যবহার থেকেই স্পষ্ট। অর্থাৎ সুদ কমানোর সিদ্ধান্তটি তাঁরা প্রত্যাহার করছেন না, প্রবল জনরোষের চাপে, ভোট হারানোর ভয়ে স্থগিত রাখছেন মাত্র। ভোট চলে গেলেই তাঁরা এটি আবার জারি করবেন।

পুঁজিপতি শ্রেণির 'পলিটিক্যাল ম্যানেজার' হিসাবে বিজেপি সরকার গত সাত বছরে জনগণের স্বার্থকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের পায়ে বিসর্জন দিয়েছে। সেই পুঁজিপতি শ্রেণিকে সস্তায় ঋণ দিতেই স্বল্প সঞ্চয়ের উপর সুদ কমিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। কিন্তু যে সরকার সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত মানুষের স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ কমিয়ে অর্থনীতিতে খরচ বাঁচাতে চায়, আয় বাড়ানোর অন্য কোনও উপায় খুঁজে পায় না, সেই সরকার একই সাথে যেমন অমানবিক, তেমনই পুরোপুরি অপদার্থ। যারা আজ বিজেপির পিছনে অন্ধের মতো ছুটছেন, এই বিষয়গুলি তাঁদের গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার।

চৌরঙ্গী, জোড়াসাঁকো এবং বেলেঘাটা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে চলেছেন

আসামে দলের প্রবীণ নেতা কমরেড মিনহার আলি মণ্ডলের জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র আসাম রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মিনহার আলি মণ্ডল দীর্ঘদিন সিওপিডিতে আক্রান্ত হয়ে ৭ মার্চ গুয়াহাটির দিসপুর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে দলের কর্মী, সমর্থক ও গুণমুগ্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মানকাচরের বাসিন্দা কমরেড মিনহার আলি মণ্ডল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। স্কুল স্তর থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর এবং আইনের ক্ষেত্রেও তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মঙ্গলদৈর দরং কলেজে অধ্যাপনা করাকালীন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আজহার হুসেনের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। তারপর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র, দলের বর্তমান পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের সাথে কয়েক দফা আলোচনার পর তিনি মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা এবং তাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচ্চ মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি মহান নেতার হাতে গড়া দল এসইউসিআই(সি)-কেই ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গ্রহণ করেন। দলে যুক্ত হওয়ার পর তিনি অনেক ছাত্র-যুবককে দলের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে পার্টির কাজ শুরু হয়। বর্তমানে দরং-এ যে নির্বাচিত জেলা কমিটি কাজ করছে সেই জেলা কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি।

১৯৭৯-১৯৮৫ সালের জাতি বিদ্বেষী ফ্যাসিবাদী আসাম আন্দোলন চলার সময়ে তাঁর জীবন বিপদাপন্ন হয় এবং তিনি কলেজের চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। পরে তিনি মানকাচর কলেজে যোগ দেন। সেখানেও তিনি সুন্দরভাবে তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে অনেককেই দলের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর মরদেহ মানকাচরে নিয়ে যাওয়ার পথে পাইকানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস, কমরেড জয়নাল আবেদিন সহ বহু কমরেড তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। মানকাচরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সময় দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুরৎজামান মণ্ডল এবং অন্যান্য কমরেডরা। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন বলিষ্ঠ নেতাকে হারাল।

কমরেড মিনহার আলি মণ্ডল লাল সেলাম

নির্বাচনেও বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। দেশব্যাপী এখন নির্বাচনী প্রচার চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করা হল।

রাজনীতি করা একটা জিনিস, আর রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক, সেটা বোঝবার চেষ্টা করা এবং সেই অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক লাইন ধরে চলব তা ঠিক করা আর এক জিনিস। সেটা ঠিক করলেই কারওর রাজনীতি করতে হয় না। অথচ সেটা ঠিক না করলে কোনও লড়াই, কোনও মানবিক লড়াই আজকের দিনে হতে পারে না, কোনও সংগঠনই দানা বাঁধতে পারে না। ফলে এ দুটো জিনিস তাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাদের বলা দরকার, এত ভয় পাচ্ছ কেন? পার্টি পলিটিক্সের কথা শুনলে এত ভয় পেয়ে যাও কেন? জোর করে কাউকে পার্টি করানো যায় কি? বিপ্লবী পার্টি তো করানো যায়ই না। যতক্ষণ না বুঝছ, তোমার উদ্বিগ্ন হবারও প্রয়োজন নেই, দরকারও নেই। কিন্তু একটি জিনিস অবশ্যই দরকার, তা হল, রাজনীতি তোমাকে বুঝতেই হবে। তুমি যদি বল, না, না, রাজনীতি বোঝবার দরকার নেই, তা হলে তুমি না বুঝলেও, রাজনৈতিক স্থিতি এবং চিন্তাভাবনা, যা ভুল, তা যদি দেশে চলতে থাকে এবং তার প্রভাব যদি বাড়তে থাকে তা হলে, যে তুমি রাজনীতি থেকে গা বাঁচাতে চাইছ, সেই তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনা, রুচি, সংস্কৃতি, পরিবার এমনকী যে সংগঠনটি তোমরা এখানে খাড়া করতে চাও, সে সবই তো সেই ভুল রাজনীতির প্রভাবে বরবাদ হয়ে যাবে। তাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে? এভরি মুভমেন্ট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই পলিটিক্স, প্রতিটি আন্দোলনই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তার প্রভাব থেকে খাদ্য থেকে শুরু করে সব কিছু, মেডিসিন পর্যন্ত মুক্ত নয়— আপনি নিজেকে আলাদা রাখবেন কী করে? ইউ আর এ সোস্যাল বিয়িং (আপনি সামাজিক সত্তাবিশিষ্ট মানুষ)। সংগঠনের কথা তো বহু দূর, এর একটি ব্যক্তি মানসিকতা পর্যন্তও তার থেকে মুক্ত রাখার উপায় নেই। আপনি ভাবতে পারেন, আমি আলাদা থাকব, এ সম্পর্কে আপনি অনবহিত থাকতে পারেন। আপনার চিন্তা-ভাবনা এরকম থাকতে পারে যে, আমি কারওর সঙ্গে, কারওর সংস্পর্শে নেই। এর মানে হল আপনি অনবহিত। আপনি জানেন না কীভাবে আপনি সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সম্পর্কিত হচ্ছেন, কীভাবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ আপনার মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, আপনার সংগঠনের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সংগঠন পরিচালনার কায়দার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই যেটাকে বলছেন, স্টাইল অব অর্গানাইজেশন, সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি বা কৌশল, এই স্টাইল অব অর্গানাইজেশন কথাটার মধ্যেও বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা, প্রোলেটারিয়েটের বিপ্লবী ভাবনা-ধারণা প্রতিফলিত হয়।

যেমন ধরুন একটা ইলেকশন এসে গেছে, তার লড়াই লড়বেন। আপনি ভাবছেন— এটা নির্বাচন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এর মধ্যে আবার বিপ্লবী রাজনীতির কী আছে? আপনার ধারণা হচ্ছে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করার যে কোনও কৌশলটাই বিপ্লবী। না, তা নয়। ইলেকশনে কংগ্রেস একটা পক্ষ, বিপক্ষ দল আর একটা পক্ষ, তার মধ্যে জনসাধারণ এসে যাচ্ছে।

যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশনের প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে, যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশনে যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়। শুধু ঐসব সেকটেরিয়ান ট্রুইজম-এর চর্চা যারা করে, যারা বিপ্লবের চর্চা করে না, তারা গা বাঁচায়, না হলে সকলকেই যেতে হয়। তা হলে গেলে সকলের কি দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে? ইলেকশন তো সকলেই করছে, বাইরের দিক থেকে দেখলে, আমি করছি, বিপ্লবী লেনিনবাদীরা করছি, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও করছে, খাঁটিরাও করছে, মেকিরাও করছে, বুর্জোয়ারাও করছে, মেকি সমাজতন্ত্রীরাও করছে। আর সকলেরই কথা হবে আমি ঠিক, বিপক্ষ দল বেঠিক। তা হলে বিপক্ষ দলকে হারাবার জন্য যে কোনও কৌশলটাই হচ্ছে সঠিক, কারণ আমি সঠিক। এইভাবে যদি আপনি যুক্তি করতে থাকেন, তা হলে বুর্জোয়া আর আপনার মধ্যে কোনও শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে না, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে না, অথচ গভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটা ভুল প্রমাণ হয়।

আসলে বুর্জোয়া আর প্রোলেটারিয়েট এ দু'জনেরই লড়াইয়ের কলা-কৌশল, কায়দা, সংগঠন পদ্ধতি, ইলেকশন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি, জেতা-হারার কলা-কৌশলটি ঠিক করাও দেশের বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলন, গণচেতনার স্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচনী আসন দখল করা এবং করে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে নানা রিফর্মস (সংস্কারমূলক কাজ) করে, নানা স্লোগান তুলে এই এগজিসটিং সিস্টেম-কেই (বর্তমান ব্যবস্থা) টিকিয়ে রাখা। যেমন করে বললে আমি জনতার মধ্যে প্রগতিশীল সেজে কিছুদিন তাকে বিভ্রান্ত করতে পারি, বোকা বানাতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি— এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তা হলে তার মূল লক্ষ্য হয়, যেভাবেই হোক সর্বাধিক নির্বাচনী আসন দখল কর। এটা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি, আশু কর্মসূচি এগুলোও সে দেয়। এই প্রোগ্রাম ও স্লোগান তাদের যাই হোক, তাদের মূল কথা হচ্ছে, গ্র্যাব ম্যাক্সিমাম সিটস।

আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার লক্ষ্য থেকে প্রোলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে একটা জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্টটা হয়, পিপলকে, জনতাকে, একটা মাস রেভোলিউশনারি লাইনের (জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের) ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। যদি দশটা রক্ষা করতে পারি, দশটাই করব, কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনই হবে না— যে কোনও উপায়ে কতকগুলো সিট দখল করা।

জনতার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিটি কী, যেটা ইলেকশনে জনসাধারণের কাছে আমি নিয়ে যাব? জনতার মধ্যে আমি যাব এই কথা নিয়ে— তুমি যখন ইলেকশন করছই তখন পিপলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ইলেকশন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের ঘাঁটিগুলি তুমি নিজে সামাল দাও। যে কয়টা সিট পাও, যতগুলো ম্যাক্সিমাম পার, এমনকী যদি সব সিটই জিততে পার, এর ভিত্তিতে এই লাইনের ভিত্তিতেই জেত। কিন্তু একমাত্র এর ভিত্তিতেই, এটাকে গোলমাল করে দিয়ে নয়। শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার তাই কর— এসব যুক্তি যদি তুমি তোল, আর বিপ্লবী তকমা এঁটে তোল, তা হলে কিন্তু বুর্জোয়ারা যেভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি এবং সেই একই ট্যাকটিক্সটাকেই বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে। এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না। এর ফলে, আমরা যে বলি ইলেকশনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পলিটিক্সকে এক্সপোজ করব, তা হয় কি? এই কথাটা মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নাকি? একদল শুধু মুখে বলে, আর একদল বাস্তবে করে। কাজেই কারা এটা শুধু মৌখিকভাবে বলছে, আর কারা প্রকৃতই সেই অনুযায়ী কাজ করছে, এ সম্পর্কে পিপলকে, জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাটাই হল আসল জিনিস।

যেমন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যের কথা সকলেই বলছে, কিন্তু কে শুধু বলছে আর কে ঐক্যের জন্য যা যা করা দরকার সেই অনুযায়ী কাজ পারুক না পারুক করছে, সেটা জনসাধারণকে দেখান। দেখান আর একদল ঐক্যের কথা বলছে কিন্তু বাস্তবে করছে যা, সেটি ঐক্য বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জনসাধারণকে এ কথাটি বোঝান, দুটো জিনিসের জন্যই ঐক্য তোমার দরকার। নিজের সংগঠনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার, আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার। আবার ঐক্য দরকার বিপ্লবী রাজনীতিকে পরিষ্কার করার জন্য, মেকি রাজনীতি থেকে মোহমুক্তি ঘটাবার জন্য।

সমাজে মোহমুক্তি ঘটাবার প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন দরকার, ফলে ঐক্য দরকার। কিন্তু এই ঐক্য নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়, সংগ্রাম বর্জন করে নয়। ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামের স্বীকৃতি চাই। যারাই ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামকে ঐক্যবিরোধী কাজ বলে তারাই শেষ পর্যন্ত ঐক্য নষ্ট করে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দোহাই দিয়ে আদর্শ কমপ্রোমাইজ করলে সে ঐক্য থাকে না। সে ঐক্যের একটিই মানে— আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কোনও একজনের পদলেহন করা। তা না হলে, ঐক্যের মধ্যে যে সংগ্রাম রয়েছে, সেটিকে জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে। সেটিকে তুলে ধরে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত উদ্যোগ নিয়ে আর স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের গণসংযোগ বাড়িয়ে যেতে হবে, পিপলস ইনস্ট্রুমেন্ট অব স্ট্রাগল, জনতার নিজস্ব লড়াইয়ের হাতিয়ার গড়ে তুলতে হবে, আর তারই মধ্য দিয়ে পিপলস পলিটিক্যাল পাওয়ার, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। এ যদি করে যেতে পারেন তবে বিপ্লব একদিন আসবেই, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম কেউই ঠেকাতে পারবে না, আপনাদের ইনকিলাবের স্বপ্ন একদিন সফল হবেই।

মহিলাদের কী উন্নয়ন করেছেন ‘সোনার বাংলা’র ফেরিওয়ালারা বলবেন কি

রাজ্যে অর্ধেকই প্রায় মহিলা ভোটার। তাঁদের দিকে তাকিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে সরকারে এলে বিজেপি মহিলাদের সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দেবে, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে, সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ করবে, কেজি থেকে পিজি সমস্ত মেয়ের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেভাবে নারীবিদ্বেষী মন্তব্য বছরভর পরিবেশন করেছেন, এখন কি ভোটের মুখে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন? দেশের নাগরিক হিসাবেই মহিলাদের শিক্ষা, রোজগার, স্বাস্থ্যের সুযোগ ইত্যাদির অধিকারী হওয়ার কথা ছিল। এ জন্য আলাদা প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে কেন? নারীর প্রকৃত সক্ষমতার জন্য গত সাত বছরে কী করেছে বিজেপি? মহিলাদের সক্ষমতার জন্য অপরিহার্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ— সেগুলির ব্যবস্থাই করতে পারলেন না তাঁরা। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অন্তত সে কথাই বলছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের তুলনায় ভারতে কর্মরত মহিলাদের হার বর্তমানে ১৪ শতাংশ কমেছে। একটি সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, ভারতে নিয়মিত রোজগেরে ব্যক্তিদের মধ্যে মহিলাকর্মী অতি সামান্য। আবার লকডাউনে যত কর্মী কাজ হারিয়েছেন তার প্রায় অর্ধেকই মহিলা। ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ বলে খুব গলা ফাটিয়ে বিজেপি চালু করেছিল ‘সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা’। এই প্রকল্পে এখন সুদ কমিয়েই চলেছে। মহিলাদের সক্ষমতা তৈরিতে বিজেপি নেতারা কতখানি উদগ্রীব এই উদাহরণেই তা স্পষ্ট।

মহিলাদের অগ্রগতি নিয়ে যারা প্রচারে সরব, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের অবস্থা কেমন? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য বলছে, দেশে প্রতি ১৬ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, প্রতি মিনিটে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হন। তা নিয়ে বিজেপি নেতারা কিন্তু নীরব। নারী পাচার, নারী নির্যাতনে বিশ্বের মধ্যে ভারত রেকর্ড গড়েছে বিজেপি শাসনেই।

প্রধানমন্ত্রী ‘বেটি বাঁচাও’-এর স্লোগান তুলেছিলেন। বেটিরা কেমন আছে বিজেপি জমানায়? উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে মহিলাদের অবস্থা ভয়ঙ্কর। ধর্ষণের সংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান দেশের প্রথম সারিতে। শিশুকন্যা নির্যাতনেও তাই। বিজেপি শাসনে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও, হাথরসে মহিলাদের উপর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের সাক্ষী গোটা দেশ। দাঙ্গাবিধ্বস্ত মুজফফরনগরে বহু মহিলা বর্বর অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। এরপর রয়েছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মহিলাদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণে এগিয়ে রয়েছে আসাম। সব ক’টিই বিজেপি শাসিত রাজ্য। এ রাজ্যে এমন ‘সোনার শাসন’ আনার কথাই কি বলছে বিজেপি?

মহিলাদের প্রতি বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। না হলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অনায়াসে বলতে পারতেন না, ‘মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়াই উচিত নয়, মেয়েদের পুরুষের নিয়ন্ত্রণে না রাখলে তারা ধ্বংসাত্মক শক্তিতে পরিণত হয়’ (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস.কম-১৭.৪.২০১৭)। তাই হাথরসের ভয়াবহ ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর উত্তরপ্রদেশের বিজেপি বিধায়ক সুরেন্দ্র সিং বলতে পারেন, ‘ধর্ষণ থেকে মেয়েকে রক্ষার দায়িত্ব পরিবারকেই নিতে হবে। সরকার বা আইনের কিছু করার নেই’। বাস্তবে ধর্ষণের জন্য মহিলাদেরই দায়ী করেছেন তিনি (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-৫.৯.২০২০)। যে দলের নেতারা কুরুচিকর, অশ্লীল মন্তব্যে মহিলাদের অসম্মান করে থাকেন অহরহ, তাঁদের মুখে মহিলাদের উন্নয়নের কথা চূড়ান্ত ভণ্ডামি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের মুখে অতি নিম্নমানের অভব্যতা-কদর্যতার প্রকাশ ঘটছে। পূর্বতন শাসক কংগ্রেস ও সিপিএম নেতারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মহিলাদের সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য কদর্যতার সীমাহীন দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি একটি ঘটনা শালীনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ রাজ্যের এক বিজেপি সাংসদ বলেছেন, ‘বাংলা নিজের মেয়েকে চাইবে কী করে, মেয়ে তো অন্যের সম্পদ।’ মহিলাদের সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গিই বিজেপির আসল সংস্কৃতি। এই ‘ছাপ্পান্ন ইঞ্চি’র সংস্কৃতি চূড়ান্ত পুরুষ আধিপত্যবাদী, যেন তালিবানি শাসনের একটা নগ্ন প্রকাশ।

কিছু দিন আগে আফগানিস্তানে তিন মহিলা সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করেছিল চূড়ান্ত অন্ধ মৌলবাদী তালিবানরা— তাঁদের অপরাধ, তাঁরা মহিলা হয়েও পেশাদার কর্মী হয়েছিলেন। একই অপরাধে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানকার এক মহিলা চিকিৎসককে। ধর্মান্ধ তালিবানিদের দৌলতে আফগানিস্তানে অহরহ ঘটে থাকে এ ধরনের ঘটনা। এখানেও কি ‘হিন্দু তালিবানি’ শাসনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে না? সমস্ত নাগরিকদের, বিশেষত মহিলাদের ভাবতে হবে এই অন্ধকার, পিছিয়ে থাকা সমাজ কি আমরা চাইব?

ফলে বিজেপি নেতারা যখন প্রতিশ্রুতি দেন— আমরা মহিলাদের উন্নয়ন করব, তখন ঘোরতর সন্দেহ জাগে বইকি।

বিজেপির ‘সুশাসন’ ঃ মিলিয়ে নিন

ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ)

- ২০১৯-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ৯.৪৯ লক্ষ কোটি টাকা (দ্য ওয়্যার, ১-৭-১৯)।
- গত ১০ বছরে ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ স্রেফ মুছে দিয়েছে ব্যাঙ্কগুলি (মানি কন্ট্রোল, ৩১-১২-২০)।
- বিদেশে পালানো মেহুল চোক্সি সহ দেশের ৫০ জন ধনকুবের শিল্পপতির ৬৮ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা বকেয়া ঋণ মুছে দিয়েছে দেশের ব্যাঙ্কগুলি।
- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেওয়া তথ্য অনুসারে ২০১৯ সালে প্রকাশ্যে এসেছে ৮৪ হাজার ৫৪৫টি ব্যাঙ্ক-জালিয়াতির ঘটনা। সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা (সিএনবিসি, ২৮-৪-২০)।

বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর মকুব ও ছাড়ের পরিমাণ

- ২০১৯-২০ সালে বড় শিল্পপতিদের উৎসাহ ভাতা ও করছাড় দিতে গিয়ে সরকারি রাজকোষে ক্ষতি হয়েছে মোট ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৩৭. ৯৭ কোটি টাকা (ইটি ১-২-২১)।
- নরেন্দ্র মোদির প্রথম দফার বিজেপি সরকার কর্পোরেট পুঁজিপতিদের ৪.৩২ লক্ষ কোটি টাকা করছাড় দিয়েছে। ক্ষমতায় এসেই ২০১৪-১৫ সালে এই সরকার ছাড় দিয়েছিল ৬৫ হাজার ৬৭ কোটি টাকা। পরে প্রতি বছর বাড়তে বাড়তে ২০১৮-১৯-এ ছাড়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকায়।

সরকারি ক্ষেত্র ও ব্যাঙ্ক বিলগ্নিকরণ

- ২০২১-এর বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী ২০২০-২১-এর মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং পবনহংস-এর বিলগ্নিকরণ সম্পূর্ণ হবে। দুটি সরকারি ব্যাঙ্ক ও জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি বিলগ্নিকরণ করতে আইন সংশোধন করা হবে। রাজ্যগুলিকেও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি দপ্তরগুলির বেসরকারিকরণে উৎসাহ দেওয়া হবে।
- সরকারের লক্ষ্য বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে ২০২১-২২ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা আয় করা।

ভরতুকি ছাঁটাই

- **খাদ্য ঃ** ২০২০-২১-এ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৩৬ কোটি। অর্থাৎ ভরতুকি ছাঁটাই হয়েছে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা।
- **সার ঃ** বরাদ্দ হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪৭ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ৭৯ হাজার ৫৩০ কোটি। অর্থাৎ সারে ভরতুকি ছাঁটাইয়ের পরিমাণ ৫৪ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা।
- **পেট্রোলিয়াম ঃ** বরাদ্দ হয়েছিল ৩৯ হাজার ৫৫ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ১৪ হাজার ৭৩ কোটি। ভরতুকি ছাঁটাই হয়েছে ২৪ হাজার ৯৮২ কোটি টাকা।

দারিদ্র ও রোজগার ছাঁটাই

- ভারতের ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ নিতান্ত দরিদ্র। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (আইএলও)-এর হিসাব অনুযায়ী দেশের কর্মরত মানুষের ৯০ শতাংশই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অর্থনীতির বেহাল দশা ও অতিমারির ধাক্কায় এই ক্ষেত্রে কর্মরত প্রায় ৪০ কোটি মানুষের জীবনে আরও বেশি সঙ্কট নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে।
- স্বাস্থ্যসমস্যার দরুন ভারতের অন্তত ৮৪ শতাংশ পরিবারের রোজগার কমে গেছে।
- ভারতের অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষ পয়সার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারেন না। চিকিৎসার বিপুল খরচ মেটাতে গিয়ে দেশের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে।
- ৮৩ কোটি ভারতবাসী দিন কাটায় ২০ টাকারও কম খরচে।

ক্ষুধা ও অনাহার

- বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০-র হিসাবে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪।
- বিশ্বের মোট ৮২ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের এক-তৃতীয়াংশ ভারতের মানুষ।
- এ দেশে প্রতিদিন পেটে খিদে নিয়ে শুতে যায় ২৩ কোটি মানুষ।
- প্রতি বছর ভারতে ৩ লক্ষেরও বেশি শিশু পেটভরা খাবার না পাওয়ার কারণে মারা যায়।
- মায়েদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে ভারতে প্রতি বছর ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ অপুষ্ট শিশুর জন্ম হয়।

আত্মহত্যার ঘটনা

- এনসিআরবি-র তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে ১০ হাজার ১৫৯ জন শিক্ষার্থী আত্মঘাতী হয়েছে। ২০১৭-তে এই সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৯০৫। ভারতে প্রতি ঘন্টায় গড়ে একজন ছাত্র আত্মহত্যা করে।
- প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন কৃষিনির্ভর মানুষ আত্মঘাতী হন। ভারতে মোট আত্মঘাতী মানুষের ৭.৪ শতাংশই কৃষিজীবী (ডাউন টু আর্থ, ৩-৯-২০)।
- শুধু ২০১৯ সালে আত্মহত্যা করেছেন কমপক্ষে ১০ হাজার ২৮১ জন কৃষিজীবী। ২০১৭-১৮-র তথ্য দেখাচ্ছে গড়ে প্রতিদিন ১০ জন দুর্দশাগ্রস্ত চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।
- আত্মঘাতী দিনমজুরের সংখ্যা আগের ছয় বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে ২০১৯ সালে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৬-৯-২০)।

ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম আন্দোলনে কালি ছেটাতে পারবে না ভোটবাজেরা

একের পাতার পর

সংযোজিত করে পুরো ব্লক জুড়ে গড়ে ওঠে ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’। এটা কোনও দলীয় কমিটি ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের মধ্যে এস ইউ সি আই (সি) যেহেতু এই আন্দোলনটা শুরু করেছিল, তাই এলাকার মানুষের কাছে এই দল অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসন পায়। আন্দোলনকে গাইড করার ক্ষেত্রে মানুষ এই দলের উপরই নির্ভর করেছে। ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’-র তিনজন আহ্বায়ক ছিলেন— এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড নন্দ পাত্র এবং কমরেড ভবানী দাস ও তৃণমূল কংগ্রেসের আবু সুফিয়ান। এই গণকমিটিতে দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ সামিল হন। সিপিএম নেতারা এখন যতই এর বিরুদ্ধে বলুন না কেন, তাঁদের দলের বহু সাধারণ সমর্থকও সেদিন কমিটির সাথে যুক্ত হন। তৃণমূল কংগ্রেস আজ ভোটের বাজারে যাই বলুক, তাদের সেদিনের রাজ্য স্তরের নাম করা নেতা, সাংসদ-বিধায়ক কেউই ১৪ মার্চের গুলিচালনা ও হত্যাকাণ্ডের আগে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের পাশে ছিলেন না। আর বিজেপি তো এসইজেডের হোতা, তাদের এই আন্দোলন সমর্থনের কোনও প্রশ্নই ছিল না। সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে বহুল প্রচারিত নেতা-নেত্রীদের ছাড়াই ৯ মাস ধরে চলেছে এসইজেড প্রতিরোধে জনগণের আন্দোলন। সেদিন জনগণ পণ করেছিল সিপিএম-দুষ্কৃতীদের রক্ষাকর্তা পুলিশকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কমিটি বারবার বলে, সরকার নিশ্চিত করুক যে সিপিএম তার হার্মাদ বাহিনীর ক্যাম্প তুলে নেবে, তা হলে জনগণও পুলিশকে গ্রামে ঢুকতে দেবে। এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ আন্দোলন ভাঙতে ১৪ মার্চ পুলিশ এবং সিপিএম হার্মাদ বাহিনী একযোগে আক্রমণ চালায় নিরস্ত্র মানুষের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের উপর। এই আক্রমণে ১৪ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং শত শত মানুষ আহত হন। শুধু তাই নয় পুলিশের পোশাক পরে সিপিএমের ভাড়া করা গুণ্ডারা নারকীয় গণধর্ষণ চালায়। যাদের অনেকের পরিচয় ‘চটি পরা পুলিশ’ হিসাবে জনগণের সামনে ফাঁস হয়ে যায়। আজ মমতা ব্যানার্জীর অবান্তর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে এদের পরিচয় লুকানোর কোনও উপায় সিপিএমের নেই। ওই বছরই ১০ নভেম্বর নন্দীগ্রাম দখল করতে আবার হামলা চালিয়ে সারা ভারতে প্রবলভাবে ধিক্কৃত হয় সিপিএম। ‘অপারেশন সানসাইন’ নামে আশেপাশের জেলা থেকে বিপুল সংখ্যায় দুষ্কৃতিদের জড়ো করে ব্যাপক আক্রমণ এবং নারকীয় অত্যাচার চলে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে নন্দীগ্রামের মানুষ খালিহাতেই সেই আক্রমণ প্রতিরোধে এক অনমনীয় দৃঢ়তা দেখান। নৃশংস ভাবে ৬ জনকে খুন করে, বহু মানুষকে আহত করেও সিপিএম এলাকার দখল নিতে পারেনি। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ছাড়াও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুখ্যাত দুষ্কৃতীর দল যে এই অপারেশনে সিপিএমের হয়ে নেমেছিল তা সে সময়েই ফাঁস হয়ে যায়। মগরাহাটের এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীর নাম তো জনগণই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দিয়েছিল। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত তথ্য দিয়ে দিয়ে দেখায়— কী ভাবে নন্দীগ্রামের পুলিশ ক্যাম্পগুলি ১০ নভেম্বরের আগে তুলে নিয়ে সিপিএমের দুষ্কৃতী বাহিনীকে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। কী ভাবে সিপিএম দুষ্কৃতীরা নন্দীগ্রামকে ঘিরে ৯ মাস ধরে সশস্ত্র ক্যাম্প করে বসেছিল। নন্দীগ্রামের মানুষকে হলদিয়া কিংবা অন্য কোনও জায়গায় তারা যেতে না দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। তাদের ভাতে মারার পরিকল্পনা ছিল সিপিএমের। চেকপোস্ট বসিয়ে প্রতিটি গাড়িতে তারা তল্লাসি করত, যাতে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির কোনও নেতা বা সিপিএম বিরোধী কাউকে দেখলেই তাকে আক্রমণ করা যায়। এ সবই মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বাবু। যদিও জননী ইটভাটার সিপিএম ক্যাম্পে কীভাবে অস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল সে কথা বুদ্ধবাবুর ভোলার কথা নয়। সিপিএমের ‘সম্পদ’ তপন-সুকুরের গাড়ি করে কীভাবে হামলায় আহতদের নিরুদ্দেশের ঠিকানায় পাচার করা হচ্ছিল, তা ধরা পড়ার ঘটনায় সেদিনের প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হয়েছে অনেক আগেই। এই ‘পরিকল্পনা’ কার রচনা তা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই জানেন। আশা করা যেতেই পারে যে তিনি তা এর মধ্যে ভুলেও যাননি! তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, তাঁর সেই হুমকির কথা, ‘নন্দীগ্রামে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না’। তাঁর সেই উক্তি— ‘দে হ্যাভ বিন পেইড ব্যাক ইন দেয়ার ওন কয়েন’, ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তিনি ভুলে যাননি নিশ্চয়ই তাঁর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কোঙারের মন্তব্যটি, ‘নন্দীগ্রামকে চারদিক থেকে ঘিরে লাইফ হেল করে দেব’! মহিলা আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে কোঙারের কদর্য মন্তব্যটি জনগণ ভোলেনি, বুদ্ধদেববাবুও কি ভুলতে পারেন?

বুদ্ধদেব বাবু যে ‘কুটিল চিত্রনাট্যে’-র কথা বলেছেন, তা ছিল আসলে সিপিএম দল এবং তার পরিচালিত সরকারের রচিত। তারা জনগণের এই আন্দোলনকে খাটো করতে আন্দোলনে মাওবাদীরা আছে বলে ধুয়ো তোলার চেষ্টা করেন। যে মিথ্যাকেও এলাকার মানুষ ফাঁস করে দেয়। বুদ্ধদেব বাবু আজ বাংলার বেকার যুবকদের নিয়ে মহা হা হুতাশে ব্যস্ত! নন্দীগ্রাম আর সিঙ্গুরে তিনি সফল হলেই সব বেকার যুবক একেবারে লাইন দিয়ে চাকরি নিয়ে ঘরে ফিরে যেত, বলে কতই না প্রচার চলছে। তাঁর অসুস্থ শরীরে এতটা চাপ নিয়ে তিনি জনগণের কত উপকার করছেন, তা টাটা-সালেম-আম্বানি-আদানি-গোয়েঙ্কাদের মতো একচেটিয়া মালিকদের টাকায় চলা কিছু সংবাদমাধ্যম বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা বিষয়ের উত্তর তাঁরা দিচ্ছেন না, সিপিএম তো পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৭ সালে। ২০০৭-এর আগে কি নন্দীগ্রাম কিংবা সিঙ্গুরের মতো উচ্ছেদ প্রকল্প করতে পারেননি বলে শিল্প গড়তে পারেননি? ওই ৩০টা বছর তাঁরা কোন শিল্প নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন? নন্দীগ্রামে বুদ্ধদেব বাবুর দল পরিচালিত সরকার গড়ে তুলতে চেয়েছিল এসইজেড। চেয়েছিল কেমিক্যাল হাব। এসইজেড কর্মসংস্থানের নয়, চরম শ্রমিক শোষণ ও তাদের বধ্যভূমি হিসাবে সারা বিশ্বে আজ ধিক্কৃত। শুধু তাই নয়, শিল্পের নামে বন্ধ কারখানার জমি, অনুর্বর জমি, বসবাসের এলাকা এবং পরিবেশ ধ্বংস সবচেয়ে কম হয় এমন জমির খোঁজ করার বদলে নন্দীগ্রাম কিংবা সিঙ্গুরের মতো উর্বর কৃষি জমির এলাকাতেই বারবার হাত পড়েছে কেন? শিল্পের নামে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষককে একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস করে ফেলার যে চক্রান্ত আজ বিজেপি প্রকট ভাবে করছে, সিপিএম কি সেই পরিকল্পনার পথ প্রদর্শক হয়েই কাজ করতে চেয়েছিল? ‘কুটিল চিত্রনাট্য’ তো আসলে এখানেই।

সরকারের উচিত কর্পোরেট মালিকদের সঙ্গে কৃষকদের বৈঠক করে একটা সমঝোতার রাস্তা বার করা— দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলেছেন সীতারাম ইয়েচুরি। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে শেষ করতে এমন একটা লাইন যে দল দেখাতে পারে, তারা নন্দীগ্রামে কোন চিত্রনাট্য নিয়ে সালেমদের হয়ে জমি দখলে নেমেছিল বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

বুদ্ধদেববাবুকে বরং একটু ‘গণশক্তি’ কাগজটা পড়তে বলা যাক। ১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের গণশক্তিতে তাঁর দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক, সীতারাম ইয়েচুরি দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গে লিখেছেন, সরকারের উচিত কর্পোরেট মালিকদের সঙ্গে কৃষকদের বৈঠক করে একটা সমঝোতার রাস্তা বার করা। আজ দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে শেষ করতে এমন একটা লাইন যে দল দেখাতে পারে, তারা নন্দীগ্রামে কোন চিত্রনাট্য নিয়ে সালেমদের হয়ে জমি দখলে নেমেছিল বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

আর একটি ছবি তাঁদের দেখতে বলব, ৩ এপ্রিল ২০২১ গণশক্তি পত্রিকা একটি ছবি ছেপেছে, বিজেপি শাসিত আসামের এক দিগন্ত বিস্তৃত ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে বেয়ে সাইকেল ঠেলছেন এক দরিদ্র মানুষ। পিছনে বসা স্ত্রীর কোলে একটি শিশু, আর একটি শিশু ঝুলছে সাইকেলের রডে বাঁধা প্লাস্টিকের থলিতে। নিঃসন্দেহে তথাকথিত কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী তথাকথিত উন্নয়নের জাঁতাকলে পিষ্ট প্রান্তিক মানুষের মর্মান্তিক ছবি। সিপিএম দল এবং তার নেতা হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই নিজেদের ‘উন্নয়নের’ ‘চিত্রনাট্য’টি চিনে উঠতে পেরেছেন নিশ্চয়ই! বিজেপির ‘উন্নয়নে’র সাথে তাঁদের সেদিনের ‘উন্নয়ন’ ভাবনার কী অদ্ভুত মিল না! বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে বিজেপি-কংগ্রেসের মতোই সরকারি গদিতে টিকে থাকার জন্য কর্পোরেট পুঁজির সেবাদাসত্ব করলে আলাদা কিছু হওয়ার থাকে কি?

সিপিএম এখন বোঝানোর চেষ্টা করছে, নন্দীগ্রাম আন্দোলন ছিল কেবলমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের একটা দলীয় আন্দোলন। জনগণের সক্রিয় ভূমিকার কথা স্বীকার করলে তাঁদের বিপদ। তাঁদের এই ফর্মুলা অনুসারে আজ যেহেতু তৃণমূলের তৎকালীন নেতাদের একাংশ বিজেপিতে ভিড়েছেন, অতএব তাঁদের নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িটা হয়ে গেল নন্দীগ্রামের চিত্রনাট্য? অথচ নন্দীগ্রাম জানে, সঠিক সত্যটা কী? যে সত্য অনুভব করেন, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষ। নন্দীগ্রাম শেখায়— উন্নয়নের নামে গায়ের জোরে দরিদ্র মানুষের জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে, তাদের উচ্ছেদ করার অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার শক্তি ধরে গরিব মানুষ। শাসকের উন্নয়ন, কর্পোরেটের উন্নয়ন আর জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন এক নয়— এই সত্য শেখায় নন্দীগ্রাম। আজ বিজেপি সরকারের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা যখন মাসের পর মাস রাস্তায় আন্দোলনে থাকেন, সেখানেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় নন্দীগ্রামের নাম। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরকে অশ্রদ্ধা করে দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করা ভণ্ডামি।

তৃণমূল নেত্রী তো বটেই তাঁর একদা বিশ্বস্ত, বর্তমানে ভোটযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীর কোনও সাধ্য নেই নন্দীগ্রামের সেই আত্মত্যাগকে আত্মসাৎ করার। তৃণমূল কংগ্রেস সেদিন কার্যত বাধ্য হয়েছিল সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলনের হয়ে কথা বলতে। বাধ্য করেছিল রাজ্যের জনগণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী প্রকৃত সংগ্রামের প্রতি তাদেরও ভয় ছিল। তাদের কাছে আন্দোলন মানে কিছু মানুষকে উত্তেজিত করে ভোটে সমর্থন লাভ। তাই এস ইউ সি আই (সি)-র বিরোধিতা সত্ত্বেও তৃণমূল নেত্রী সিঙ্গুরের চাষের মাঠ থেকে আন্দোলনকে ধর্মতলার অনশন মঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে লাভ হয়েছিল সরকারের এবং টাটার। তারা জমি দখল করে নিতে পেরেছিল। নন্দীগ্রামেও এমন সস্তা চমকের বহু রাস্তা নেওয়ার চেষ্টা তাঁরা করলেও সেখানে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে জনগণ এতটাই ঐক্যবদ্ধ ছিল যে এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

পরবর্তীকালে সংবাদমাধ্যম তৃণমূল কংগ্রেসকেই নন্দীগ্রামের একমাত্র শক্তি হিসাবে তুলে ধরেছে। কারণ জনগণ গণকমিটির মাধ্যমে লড়ে দাবি আদায় করছে, এই বার্তা পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের ধ্বজাধারীদের কাছে বড় বিপদের ইঙ্গিত বহন করে। তারা আন্দোলনকে ভোটের বাক্সে পুরে তার আগুন নিভিয়ে ফেলতে চায়। প্রচারের জোরে তৃণমূলই নন্দীগ্রামের ত্রাতা সাজে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বেও আগের শাসকদের যে অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তুলেছিল, সেই স্বজন পোষণ দুর্নীতি, দলবাজি, সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দান চলতেই থাকে। ফলে জনমানসে ক্ষোভ বাড়ছে। এর সুযোগ নিয়ে বিজেপিতে ভিড়ে তৃণমূলের তৎকালীন নেতা এখন ভোটে মহা সংগ্রামী সাজছেন। তার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী অবান্তর কিছু কথা বলছেন। এতে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মহত্ত্ব এতটুকু খাটো হয় না। নন্দীগ্রামের নাম করে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম যত কাদা পরস্পরের দিকে ছুঁড়ছে সে কাদা তাদের গায়েই পড়ছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করব অথচ নিজের বসনটি শুভ্র থাকবে— কারও পক্ষেই এ আশা করা বৃথা।

পাঠকের মতামত

ভোট নষ্ট

যে দল ক্ষমতায় আসতে পারবে সেই দলকেই ভোট দেব, অন্য দলকে ভোট দেওয়া মানে ভোট নষ্ট, নির্বাচনের আগে জনতার একাংশের মনে এমনই চিন্তাধারা চলতে থাকে। এই প্রবণতা অবশ্য বিভিন্ন গদিলোভী দল তৈরি করেছে। যেদিকে হাওয়া, সে দিকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা ভয়াবহ। এই হাওয়াটাকে আরও প্রবল করে এক শ্রেণির গণমাধ্যম। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যেক প্রার্থীকে সমান প্রচার অনেক গণমাধ্যমেই দেয় না। হাওয়া নয়, যে দলকে সঠিক মনে হবে সেই দলকেই ভোট দেবো এই চিন্তা নিয়ে ভোট দেওয়া দরকার সবার। কে ক্ষমতায় আছে, কে ক্ষমতায় আসতে পারে, কার এমপি এমএলএ আছে, কে বড়ো দল কে ছোটে দল এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আমজনতার ভাবা উচিত কোন দল জনগণের সমস্যা সমাধানে আন্দোলন করে, কোন দলের নেতা কর্মীরা নীতি আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত জীবন সহ রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করে। ভোটের আগে জনমত সমীক্ষা প্রকাশ করছে কিছু সংস্থা। রাজ্যে প্রায় ১০ কোটি জনসংখ্যা সেখানে মাত্র কয়েক হাজার মানুষের মতামত নিয়ে সমীক্ষা বেশিরভাগ জনগণের মতামত প্রতিফলিত করে না এই জনমত সমীক্ষা। মূলত দুটি দলের হয়ে হাওয়া তোলার কাজটা করে। হয় এই দল, না হয় ওই দল।

ভোটের আগে জনমত সমীক্ষা প্রকাশ বন্ধ করা প্রয়োজন। ভোট কোনও উৎসব নয়, ভোট কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ জন্য প্রতিটি ভোটার নিজের বিধানসভা এলাকার প্রার্থীদের বিশ্লেষণ করে দেখবেন। প্রার্থীদের দলের নীতি, কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবেন। এরপর যে প্রার্থীকে সঠিক মনে হবে তাকেই ভোট দেবেন।

সাধারণ মানুষ যে দলকে ভোট দেয়, সে দলের প্রতি একটা আবেগ থাকে। কিন্তু সেই দলেরই নেতা মন্ত্রীরা এক দলে টাকা কামানো শেষ হলে অন্য দলে চলে যাচ্ছেন। শাসকদলগুলো রাজনীতিকে ব্যবসায় পরিণত করেছে।

আবার সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যেও ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়ার মানসিকতা কাজ করে। পঞ্চায়েত ঘনিষ্ঠ থাকলে সহজে একশো দিনের কাজ সহ কিছু সরকারি সুবিধা পাওয়া যাবে এই ভেবে অনেকেই শাসকদলে ঘেঁষে থাকেন। শাসকদলের প্রতি ঘৃণা থাকলেও শাসকের পক্ষেই ভোট দিয়ে দেন।

সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে সবাই পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই ভাবতে হবে চাকরির সংস্থানের জন্য কোন দল কী করছে। বছরের পর বছর নিয়োগ নেই। শূন্যপদের অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে। যতটুকু নিয়োগ ভোটের স্বার্থে হচ্ছে সেখানেও ভয়াবহ দুর্নীতি।

শিক্ষা স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ মানে সাধারণ জনগণকে বিপদে ফেলা। তাই কোন দল শিক্ষা স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ রুখে দিয়ে সরকারি শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা দেখাচ্ছে সেই দলের দিকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা প্রয়োজন।

দেশ বা রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ শ্রমিক বা কৃষক। কৃষকের জীবনের মূল সমস্যা ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া আর ফসল উৎপাদনের জন্য চাষের খরচ বৃদ্ধি। কোন দল ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার সুপরিকল্পনা করছে সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। সার, বীজ, কীটনাশক সহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের জন্য সরকারিভাবে কারখানা তৈরি করলে কৃষক লাভবান হবে।

আমি ভোট দেব সেই দলকেই যে দল বেকার সমস্যা সমাধানে সঠিক দিশা দেখাবে, সরকারি শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর সদিচ্ছা দেখাবে, সরকারি চাকরির শূন্যপদ বৃদ্ধিঘটানোর কথা বলবে, শূন্যপদের অবলুপ্তি না ঘটিয়ে প্রতি বছর দুর্নীতিমুক্ত ভাবে চাকরিতে নিয়োগ করবে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দেবে, শ্রমিকের কাজের নিশ্চয়তা দেবে, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের সরঞ্জাম তৈরির জন্য সরকারিভাবে কারখানা খুলবে।

আব্দুল জলিল সরকার
কোচবিহার

মতবাদিক বিতর্ক নেই, কেবলই কুৎসা

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দলের বিভিন্ন নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দলের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রী ও নেতৃত্ব নির্বাচনী সভাগুলিতে যেভাবে ব্যক্তিগত কেচ্ছা বা কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত হয়েছেন, তা রাজনীতির অধঃপতনকেই সূচিত করে।

স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে বহুবার নির্বাচন হয়েছে। বোধ হয় এ ধরনের কালচার ইতিপূর্বে রাজ্যবাসী কোনও নির্বাচনে লক্ষ করেনি। বিদ্যাসাগর-নেতাজি-ক্ষুদিরাম সহ বহু বরেণ্য মানুষের কর্মস্থল যে রাজ্যে, সে রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের এ ধরনের সংস্কৃতি বেমানান। এই ঘটনা দেখায় যে, মতবাদিক বিষয়ে তর্কে-বিতর্কে তাদের আগ্রহ নেই।

নির্বাচকরা চায়, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরুক। সেই বক্তব্য বিচার করেই জনসাধারণ তাঁদের পছন্দমতো প্রার্থীকে বেছে নেবে।

লক্ষণীয় বিষয়, নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। নির্বাচকরা চায়—অবিলম্বে এই ব্যক্তিগত কুৎসার রাজনীতি বন্ধ হোক।

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক
পূর্ব মেদিনীপুর

মোদির ‘ডাবল ইঞ্জিন’ পিষে দিচ্ছে জনগণকে

একের পাতার পর

দারিদ্র ও ক্ষুধা

● উত্তরপ্রদেশে জনসংখ্যার ২৯.৪৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন।

● লকডাউনের পর রাজ্যের ৬২ শতাংশ পরিবারের আয় আগের তুলনায় অনেকটা কমে গেছে। মুসাহরি সহ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন সংকটের চাপে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মুরগির ফেলে দেওয়া পালক সংগ্রহ করে তা থেকে মাংস খুঁটে খেয়ে বেঁচে থাকে এই মানুষগুলি (কাউন্টারভিউ ১০-১২-২০)।

বিদ্বেষজাত অপরাধ

● দলিত সম্প্রদায় সহ পিছিয়ে পড়া তথা প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষজনিত অপরাধের সংখ্যায় পর পর তিন বছর সর্বোচ্চ স্থানে উত্তরপ্রদেশ। শুধু ২০১৮ সালেই ২০০-র বেশি বিদ্বেষজাত অপরাধের ঘটনা ঘটেছে এই রাজ্যে (দ্য ফার্স্টপোস্ট, ৬-৩-১৯)।

● সংখ্যালঘু ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচারের নিরিখে উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে এগিয়ে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্য বলছে, ২০১৬-২০১৯— এই তিন বছরে গোটা দেশে এ ধরনের ২ হাজার ৮টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে এগুলির মধ্যে ৮৬৯টি ঘটনা, অর্থাৎ ৪৩ শতাংশ অপরাধই ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে।

● উত্তরপ্রদেশে দলিতদের হয়রানি করার ঘটনা ২০১৬-১৭ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে ৪১ শতাংশ বেড়েছে। এ শুধু জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নথিভুক্ত ঘটনা। এর বাইরে যে আরও অসংখ্য ঘটনা আছে, তা বলাই বাহুল্য। সংসদে ২০২০-র ১৬ জুলাই স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই তথ্য দিয়েছেন।

মহিলাদের ওপর অত্যাচার

● মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ শীর্ষে।

(হিন্দুস্তান টাইমস, ৩-১০-২০)।

● ২০১৬ থেকে ২০২০— এই চার বছরে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের ওপর অত্যাচার ৬৬ শতাংশ বেড়েছে।

● শুধু ২০১৯ সালে উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩ হাজার ৬৫টি।

(জি নিউজ, ৭-১০-২০)।

● প্রতিদিন এ রাজ্যে ১১টি ধর্ষণের ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়। বাস্তব সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরও অনেক বেশি (ঐ)।

● পণজনিত মৃত্যুর ঘটনায় শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। সংখ্যাটি হল ১১ হাজার ৮০০।

(রেডিফ ডট কম, ৩১-১-১৯)।

আইনশৃঙ্খলা

● হাথরস, উন্নাওয়ের যে ভয়াবহ ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সারা দেশ শিউরে উঠেছে, তা বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশেই ঘটেছে।

● ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশে ২১ হাজার ৭১১টি অপহরণ, ৮ হাজার ৯০৮টি দাঙ্গা এবং ৩ হাজার ২১৮টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক বছরে হিংস্র অপরাধের ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে (হিন্দুস্তান টাইমস, ১০-১-২০)।

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু ও ব্যাপক সংখ্যায় গ্রেফতারি

● সংসদে সরকারের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০-তে প্রতিদিন পুলিশ হেফাজতে গড়ে ৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়। এই এক বছরে দেশে এ ভাবে মৃত্যু হয়েছে মোট ১৬৯৭ জনের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে ৪০০ জনের। উত্তরপ্রদেশের ৭২টি জেলে বন্দির সংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজার ২৯৭। অথচ জেলগুলিতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ৬০ হাজার ৩৪০ জনের।

ভুয়ো সংঘর্ষ

● সরকারে আসার পর বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একটি টেলিভিশন-সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘অপরাধ করলে মেরে ফেলা হবে’। অর্থাৎ আইনের শাসনের বালাই নেই, গায়ের জোরই শেষ কথা। সম্ভবত তাঁর নির্দেশ মেনেই ২০১৭-র মার্চে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০২০ পর্যন্ত অভিযুক্তদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৬ হাজার ১৪৫টি। মৃত্যু হয়েছে ১১৯ অভিযুক্তের। আহত হয়েছেন ২ হাজার ২৫৮ জন (স্ক্রোল ডট ইন, ২৩-৭-২০)।

● ২০১৫ থেকে ২০১৮— এই তিন বছরে ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনায় গোটা দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে উত্তরপ্রদেশ (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৫-৬-১৯)।

এসব ছাড়াও যোগী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে উত্তরপ্রদেশে একের পর এক হত্যা, ধর্ষণ, নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর হামলা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার সহ অসংখ্য অপরাধের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ঘটে চলেছে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ ও তাঁদের মুখ বন্ধ করানোর অপচেষ্টা। এই পথেই উত্তরপ্রদেশে দুর্নীতি ও অপশাসনের অসংখ্য সত্য ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করে চলেছে বিজেপি সরকার। এই রাজ্যেই বিজেপি সরকারের নির্দেশে মানবদরদী চিকিৎসক, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাফিল খানের ওপর নির্মম বর্বরতা চালিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। ঘটেছে একের পর এক পিটিয়ে খুন ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা। চালু হয়েছে লাভ জিহাদ আইন, যাকে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দীপক গুপ্তা সম্পূর্ণ সংবিধানবিরোধী বলে অভিহিত করেছেন। যে ডাবল ইঞ্জিনের হয়ে গলা ফাটিয়ে চলেছেন মোদি-শাহরা, তারই প্রভাবে উত্তরপ্রদেশে জনজীবন এভাবেই প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে।

(চলবে)

‘বিকলাঙ্গ গণতন্ত্র’

(সুচিন্তিত এই প্রবন্ধটি লিখেছেন সারা বাংলা এন আর সি বিরোধী নাগরিক কমিটির সভাপতি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটির সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্বতন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চট্টোপাধ্যায়)

প্রায় সাত দশকের তথ্য এবং অভিজ্ঞতা বলে যে পশ্চিমবঙ্গে যখনই কোনও গণতান্ত্রিক প্রশাসনের রদবদলের সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দেয় তখনই সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসা, প্রতিহিংসা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম হানাহানি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সেই ভয়ঙ্করতা শহরের তুলনায় গ্রামে গঞ্জে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্করতর হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত নির্বাচনোত্তর সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। প্রায় সর্বত্র একটা অশান্তি, আশঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। সেই বাতাবরণের গেরোয় আমরা ছাপোষা মানুষ, বিশেষ করে শান্তিকামী নাগরিকগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজ জীবনের তলানিতে ঠেকে। কিছুই তখন অস্বাভাবিক নয় বলে বোধ হয়। আমরা ওই আবহাওয়ায় ক্লান্ত অবসন্ন এবং আশঙ্কিত বোধ করি এবং এক দুঃসহ সমাজজীবন যাপন করি। এই দুঃসহ অবস্থা নিঃসন্দেহে সর্বৈব ভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রে নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে, নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে এটাই তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো তারই সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবে, নাগরিকের সেই প্রত্যাশা কোনওভাবেই বেশি চাওয়া বা বেশি পাওয়া নয়। সেই প্রত্যাশা পূরণের অভিপ্রায়ে আমাদের দেশে সরকারি কর্তৃত্ববিহীন একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। যে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

১৯৫২ সাল থেকে তারাই দেশের লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে একমাত্র নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনের সময় (১৯৯০-১৯৯৬) ছাড়া কোনও সময়ই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে, নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে হয়নি। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কোনও কোনও সময় প্রশ্ন উঠেছে। এই মন্তব্যে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। প্রায় সব সময় পেশিশক্তির সঙ্গে সমস্ত রকমের অস্ত্রশক্তি ব্যবহৃত হয়েছে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রচেষ্টায়। এই দুই শক্তি আবার রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতিগ্রস্ত মেধা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাচনকে অগণতান্ত্রিক এবং কলুষিত করার উদ্দেশ্যে। প্রতিপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন, বুথজ্যাম থেকে শুরু করে ছাপ্পা ভোট, ভোট বাক্স ডাকাতি পর্যন্ত সমস্ত রকমের দুর্নীতির ব্যবহার এই নির্বাচনগুলিতে হয়েছে। এই অগণতান্ত্রিক অবস্থা থেকে কি আমাদের মুক্তির কোনও উপায় নেই? নিরাশাব্যাঞ্জক অভিব্যক্তি দুর্ভাগ্যজনক হলেও দুঃখজনক ভাবে বাস্তব সত্যি। এই দুঃসহ অবস্থাকে কিছুটা হলেও লঘু করবার চেষ্টা করেছে কতকাংশে শক্ত নির্বাচন কমিশন, কখনও বা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের উচ্চ এবং সর্বোচ্চ আদালতগুলির প্রয়াস। কোনও আদালতই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কখনওই নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু কোনও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ যদি তেমন ভাবে নির্বাচনের দোষত্রুটি নিয়ে আদালতে গেছে তখনই প্রয়োজন মাফিক নির্দেশ দিতে আদালত কুণ্ঠাবোধ করেনি বা পিছুপা হয়নি। আদালত নির্বাচনকে দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও স্বচ্ছ করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে আর সেই হস্তক্ষেপকে দেশের মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। সাধারণ নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে দেশের আদালত তার যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করে চলেছে।

দেশের বিচারব্যবস্থা যখনই কোনও প্রাক নির্বাচনী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে তখনই আদালত বলেছে যে একবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে গেলে বিচারবিভাগের উচিত নয় তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা। এর স্বপক্ষে একটিই যুক্তি কাজ করে যে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং স্বাধীনভাবে ঘটানোর দায়িত্বে থাকা নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নয় কোনও বিচারালয়ের, যেহেতু তেমন হস্তক্ষেপ অনধিকার হস্তক্ষেপই হবে। আইনসঙ্গত ভাবে সৃষ্ট সুষ্ঠু নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন সংগঠিত করার সুযোগ দেওয়া বিধেয়। এই যুক্তি অবশ্য মনে হয় সম্পূর্ণ নিখুঁত যুক্তি নয়। তেমন প্রয়োজন কালে আদালত যথাযোগ্য নির্দেশ দিতেই পারে নির্বাচন সুসংগঠিত করার প্রয়োজনে অবস্থার চাহিদা অনুসারে। এমনকি নির্বাচন কমিশনকেও তেমন নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে। সমস্ত প্রচেষ্টার একটিইমাত্র মহৎ অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে ত্রুটিবিহীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন ঘটানো। কেন না সেটাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সর্বোপরি জনস্বার্থ।

সম্প্রতি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের উচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থেকেছে। অবশ্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে একটি অপ্রয়োজনীয় মুচলেকা আদায় করেছে এই মর্মে যে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু এবং স্বাধীন নির্বাচন ঘটানোর জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাবে। এই মুচলেকা অর্থহীন, কেন না নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের আইনানুগ কর্তব্য এবং দায়িত্ব। মাননীয় আদালত তার অভিমত ব্যক্ত করেছে অত্যন্ত সংযতভাবে, কোনও অতিশয়োক্তি নেই এবং প্রায় আইনানুগ ভাবেই। ওই জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারীর হতাশ হওয়ার আপাত কোনও কারণ ধরা পড়ে না। শুধু একটিই প্রশ্ন এরপর থেকে যায় এবং সেটা হচ্ছে এই যে— এটা কি ঠিক যে নির্বাচন কমিশনেরই কি একক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সংগঠিত করার?

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক এবং একমাত্র দায়িত্ব হলেও হতে পারে, কিন্তু এটা তার একক দায়িত্ব হতে পারে না। প্রয়োজন বোধে আদালত নির্বাচন কমিশনকে কখনও কখনও সাহায্য এবং সহযোগিতাও করেছে। **নির্বাচন কমিশন অবশ্যই একটি নিরপেক্ষ অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাকে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সংগঠিত করার জন্য তার সেই নির্ভরতা অনেক সময়ই উদ্বেগের কারণ ঘটায়।** আর সেই উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পায় যখন রাজনৈতিক দল গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভিন্ন রাজনৈতিক দলগঠিত রাজ্য সরকারের সদ্ভাবের অভাব থাকে। ইতিমধ্যেই একটি রাজনৈতিক দল গত ১৬ মার্চের এক জনসভায় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল যুযুধান, যাদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছে এবং অপরটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। এই নাটকে পারস্পরিক স্বার্থ বিরোধী দুই রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি অবশ্যই যথেষ্ট শঙ্কার কারণ সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের দুই স্বার্থ বিরোধী শিবির যে এই প্রথম যুযুধান তা নাও হতে পারে কিন্তু দুই মারমুখী স্বার্থ বিরোধী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব সম্ভবত এই প্রথম একটি অভূতপুর্ব বিপর্যয় আনার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এক দল যদি বলে ‘খেলা হবে’, অপর দল তারও থেকে উচ্চস্বরে বলে ‘খেলা হবে’। কেউ কেউ বলেন যে সেই খেলা নির্বাচনের আগে যেমন হবে, তেমনই হবে নির্বাচনের দিনগুলোতে এবং নির্বাচনের অব্যবহিত পরে। কে কত ভয়ঙ্কর খেলা খেলতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলার সম্ভাবনা সাধারণ নাগরিককে ভীত এবং সন্ত্রস্ত করেছে। সেই খেলার কুশীলব কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থক। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের সমস্ত সমর্থকই সেই খেলায় অংশগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র তার উগ্র সমর্থকই সেই খেলায় অংশগ্রহণ করে দলের কাছে বাহবা পেতে চায়। সেই উগ্র সমর্থকেরা কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে, আবার কেউ কেউ পরোক্ষভাবে সেই ভয়াবহ খেলায় অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থক অবশ্যই পরিবর্তনশীল। যারা গতকাল এক দলের সমর্থক ছিল তারাই আজ অপর এক বিরোধী দলের সমর্থক আর তারাই আবার কোনও তৃতীয় দলের সমর্থক পরশু।

খেলায় অংশ নেওয়ার মতো সমর্থকদের কেবল মাত্র রঙ বদলায়। তারা উগ্র সমর্থক এই আর কী! তাদের কার কতখানি উগ্রতা তার বিচার অর্থহীন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও কেবলমাত্র রঙ বদলায়। গণতান্ত্রিক আদর্শ বলে কারুর কিছু থাকে না। সমর্থকেরা আদর্শে অনুগত নয়, তারা তাদের নেতা বা নেত্রীর অনুগত। না হলে রাতারাতি কী করে সব পাল্টে যায়। তারা বেশিরভাগই ‘দলবদলুর’ দলে পড়ে। কোন দলে গেলে কত মুনাফা বা ফায়দা হবে সেই পরিমাণই নির্ধারণ করে কে কোন দলে কখন থাকবে বা কখন যাবে। এই মুনাফা বা ফায়দার বিচার যেমন নেতা-নেত্রীর থাকে ঠিক তেমনই থাকে তাদের অনুগত সমর্থকদের। হিংসাত্মক ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদত থাকে বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। নির্বাচনী অপকর্মে কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষ মদত থাকলেও থাকতে পারে। সবার উদ্দেশ্য তো একটিই, নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রশাসনের ক্ষমতায় আসা। নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশ সেবা করার পরিবর্তে আত্মসেবা দুর্ভগ্যজনকভাবে শিরোধার্য। নির্বাচন কতটা পঙ্কিল বা স্বচ্ছ হবে তা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলগুলির ইচ্ছে-অনিচ্ছার উপর। তারা কীভাবে তাদের উগ্র সমর্থকদের পরিচালিত করবে তারই উপর। তাই নির্বাচনে তাদের ভূমিকার গুরুত্বের কথা অনস্বীকার্য। সেই ভূমিকা সদর্থক হবে না কদর্থক হবে তা মোটামুটি আমাদের অজানা। সেই ভূমিকাকে সদর্থক করার পক্ষে আদালতের যে একটি ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে এটা অনেকেরই পক্ষে অনুধাবনযোগ্য নয়।

উল্লিখিত জনস্বার্থ মামলায় যেমন কেন্দ্রীয় সরকার তেমনই রাজ্য সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে। এদের প্রত্যেকের সহযোগিতামূলক সদর্থক ভূমিকা অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের কাজকে প্রভূত পরিমাণে সহজ করবে—এই বিশ্বাসেই তাদের মামলায় সংযুক্তি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সপ্তাহের সাতদিন আর চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি মুহূর্ত সতর্ক নজর রাখা প্রায় অসম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে আদালত সেই জনস্বার্থ মামলায় কোনও মুচলেকা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। সেই মুচলেকার কতটা বাস্তব মূল্য থাকত সেই নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক করা চলে, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা চলে না তাদের যথাযোগ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তাদের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে কমিশনের দায়িত্ব বা কর্তব্যকে কোনওক্রমেই লঘু করা হত না। সেই রকম কোনও নির্দেশ দিলে রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করার সামিল হত না। বরং সেটাই সর্বতোভাবে অভিপ্রেত ছিল। সেই জনস্বার্থ মামলায় সেই মর্মে কিছু অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করারও প্রার্থনা ছিল। মহামান্য আদালতের কাছে সেই প্রার্থনাগুলির কোনও তাৎপর্য ধরা পড়ল না। সেটাই মহামান্য আদালতের বাস্তবদর্শিতার অভাব বলে খেদ করা চলে অবশ্যই। আর সেই খেদই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের কি তবে সেই ‘বিকলাঙ্গ গণতন্ত্রে’-ই জীবন কাটিয়ে যেতে হবে? আমরা কি নির্বাচনে উন্মুক্ত শান্ত পরিবেশে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারব না?

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবনমন সাধারণ নির্বাচনগুলিতে বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে। সেই সমস্ত মূল্যবোধের মধ্যে সেরা মূল্যবোধ হচ্ছে প্রতিপক্ষের অস্তিত্বকে সর্বতোভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাকে সম্মান জানানো আর এই মূল্যবোধ বিধানসভা বা লোকসভা বা রাজদ্যসভার অভ্যন্তরে যেমন প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজন ঠিক তেমনই প্রয়োজন তার বাইরেও। কেবলমাত্র নির্বাচনকালেই নয়, পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং সম্মান থাকা দরকার নিরন্তর। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রাথমিক এবং আবশ্যকীয় মূল্যবোধ পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, সারা ভারতবর্ষেই প্রায় অবলুপ্ত। রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের সমর্থকেরা অকথা, কুকথার খেউর চালায় সর্বত্র। প্রতিপক্ষকে নির্বাচনে প্রতিযোগী হওয়ার সুযোগ থেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করার খেলা চলে। সবকিছুরই উদ্দেশ্য এক। নির্বাচনে যেন তেন প্রকারেণ জয়ী হওয়া। রাজনীতির লোকেরা এও বলেন যে, ‘প্রেমে’, ‘যুদ্ধে’, বা ‘নির্বাচনে’ কিছুই অনভিপ্রেত নয়। সমস্ত পন্থাই, সে সু হোক কী কু হোক, গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য। এই অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চক্কর থেকে উদ্ধার পাওয়া দুষ্কর বলেই বোধ হয়। তাই তো আমাদের দেশে গণতন্ত্র ভীষণভাবে ‘বিকলাঙ্গ’। গণতন্ত্র যাতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা জরুরি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এস ইউ সি আই (সি) এগিয়ে

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বাম দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক আসনে লড়ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। কেরালার অগ্রগণ্য মালয়ালম দৈনিক 'মাতরুভূমি' ৩১ মার্চ এই মর্মে একটি প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। ১৪ লাখের মতো পাঠক এই পত্রিকার। পত্রিকাটি যে তথ্য পরিবেশন করেছে তাতে সিপিআই লড়ছে ৫০টি আসনে, সিপিএম ২২৭টি আসনে এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) লড়ছে ২৫৮টি আসনে। যদিও পরে আরও কিছু আসনে প্রার্থী দেওয়ায় সংখ্যাটা বেড়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬টি, কেরালায় ৩৬টি, আসামে ২৮টি তামিলনাড়ুতে ৫টি এবং পুদুচেরিতে ৩টি, মোট ২৬৮টি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ২৩টি রাজ্যে ১১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। সিপিআই(এম) লড়েছিল ৭১টিতে, সিপিআই ৫৪ এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ১৫টিতে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ২৭টি রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাংগঠনিক ভিত্তি রয়েছে। তার মধ্যে বেশ কিছু রাজ্যে তা শক্তিশালী। ২০০৯ সালে সাংসদ ছিল একজন, ডাঃ তরুণ মণ্ডল। আসামে ২ জন এবং ওড়িশায় একজন বিধায়ক ছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় অফিস কলকাতায়, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ এবং কেরালা রাজ্য সম্পাদক ডাঃ ভি ভেনুগোপাল।

গ্যাসের দাম দশ টাকা কমিয়ে
মানুষের সাথে ঠাট্টা করল বিজেপি

গত তিন মাসে কয়েক দফায় গ্যাসের দাম ২২৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে লাগাতার ভরতুকি কমিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই দুইয়ের ফলে গ্যাসে প্রায় সাড়ে চারশো টাকার অতিরিক্ত বোঝা চেপে গ্যাসের দাম হয়েছে ৮৪৫ টাকা। এই অবস্থায় হঠাৎ পাঁচটি রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের মুখে এসে গ্যাসের দাম ১০ টাকা কমিয়ে 'সরকার কত ভাল' তার ফলাও প্রচার করছে বিজেপির নেতা-মন্ত্রী এবং প্রচারক বাহিনী।

বাস্তবে লাগাতার দাম বাড়িয়ে চলার পর ভোটের মুখে এসে ১০ টাকা দাম কমানোর মধ্য দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর সাথে ঠাট্টাই করলেন বিজেপি নেতারা। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় বসার পর থেকে 'জনগণকে কোনও ভরতুকি নয়, সব ভরতুকি পুঁজিপতিদের' নীতি নিয়ে চলছে বিজেপি সরকার। সেই নীতি অনুসারেই সাধারণ ও গরিব মানুষের অপরিহার্য ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস থেকে ভরতুকি কমাতে শুরু করে এবং এখন তা প্রায় শূন্যের কোঠায়। পেট্রলে ভরতুকি কংগ্রেস সরকারই তুলে দিয়েছিল।

দেশের মানুষকে ধোঁকা দিতে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা অবশ্য জ্বালানি তেল কিংবা গ্যাসের দাম বাড়ানোর পিছনে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়াকেই দায়ী করছেন— যা ডাহা মিথ্যা। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় বসার সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু ১৩০-১৪০ ডলার। মার্চের গোড়াতেও দাম ছিল ৭০ ডলার, এখন তা আরও নেমে এসেছে ৬৩ ডলারে। অথচ সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তায় হেঁটে তেল-গ্যাসের দাম বাড়িয়েই চলেছে বিজেপি সরকার। ২০১৪ সালের ১ মার্চ রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৪১০.৫ টাকা। আর এ বছর মার্চে সেই একই সিলিন্ডারের দাম হয়েছে ৮৪৫ টাকা। একই ভাবে গত সাত বছরে বেড়েছে রেশনে সরবরাহ করা কেরোসিনের দামও। ২০১৪ সালে লিটার প্রতি ১৪.৯৬ টাকা থেকে বেড়ে ২০২১-এ তা হয়েছে ৩৬ টাকার উপর।

সরকার যদি সত্যিই সাধারণ মানুষকে বিপুল মূল্যবৃদ্ধি থেকে রেহাই দিতে চাইত তবে যে বিপুল পরিমাণ করের বোঝা তেল-গ্যাসের উপর তারা চাপিয়ে রেখেছে তা খানিকটা কমাতে পারত। সরকার চাইলে তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফা কিছুটা কমিয়ে মানুষকে সুরাহা দেওয়ার জন্য তাদের বাধ্য করতে পারত। কিন্তু আম্বানি, আদানি গোষ্ঠী, এসার গোষ্ঠীদের লাভের সুযোগ করে দিতে সে চেষ্টা করেনি। বাস্তবে সরকার রান্নার গ্যাস এবং তেলের দাম বাড়ানোর মধ্য দিয়ে সরকারি কোষাগারকেও ভরিয়ে তুলেছে। পেট্রোপণ্য এবং এলপিজির উপর চাপানো উৎপাদন শুল্ক থেকে গত ৯ মাসে ৩ লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়েছে কেন্দ্রের কোষাগারে। যা গত সাত বছরে সর্বোচ্চ। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দেওয়া। তথ্য অনুযায়ী, এই প্রথম ৯ মাসের মধ্যেই তেল-গ্যাসের শুল্ক আদায় ৩ লক্ষ কোটি ছাড়াল। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, গত ৭ বছরে পেট্রোপণ্যে কেন্দ্রের সংগৃহীত শুল্কের পরিমাণ ৪৫৯ শতাংশ বেড়েছে (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মার্চ, ২০২১)।

ফলে সরকারের দাম বাড়ানোর পিছনে কাজ করেছে একদিকে সরকারি এবং বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া, কার্যত তাদের হাতে তেল-গ্যাস সহ প্রাকৃতিক সমস্ত সম্পদ তুলে দিয়ে অবাধ লুঠের সুযোগ করে দেওয়া, অন্য দিকে অস্বাভাবিক রকমের চড়া সরকারি কর চাপানো। তার সঙ্গে রয়েছে জনগণকে কোনও কিছুতেই ভরতুকি না দেওয়ার বিজেপি সরকারের নীতি। এই যে সরকারের আসল চরিত্র সে সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা আজ এ রাজ্যে এসে যে অজস্র প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, সেগুলি যে সবই আসলে জুমলা অর্থাৎ লোক ভোলানো কথা, মানুষকে তা অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝে নিতে হবে।

পাঞ্জাবে শহিদ-আজম ভগৎ সিং স্মরণ

২৩ মার্চ পাঞ্জাবে ভগৎ সিং-রাজগুরু-সুখদেবের শহিদ দিবস পালন করে এ আই ডি এস ও। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অন্যতম এই বিপ্লবীরা শুধু বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি চাননি, সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য পূরণ হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আজও অপূরিত। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ আজও অব্যাহত শুধু নয়, বহুগুণ বিস্তৃত। চলছে কৃষি আইনের মধ্য দিয়ে কৃষককে সর্বস্বান্ত করার ষড়যন্ত্র। যার বিরুদ্ধে দিল্লিতে চলছে কৃষকদের ঐতিহাসিক আন্দোলন। এই প্রেক্ষাপটে ভগৎ সিং সহ অন্যান্য মনীষীদের স্মরণ করে এআইডিএস ও।

পাতিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিয়ে ভগৎ সিং শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আই ডি এস ও-র বুক স্টল থেকে প্রচুর বই কেনে ছাত্ররা। 'শিক্ষা সংস্কৃতি ও নীতি-নৈতিকতার সংকট প্রসঙ্গে' বইটির পাঞ্জাবী সংস্করণ প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়।

বুঢলাডায় তিনটি স্থানে ছাত্র যুবদের নিয়ে ভগৎ সিংয়ের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ধৃতি প্রদর্শনী এবং জনগণের মধ্যে ব্যাজ পরানো হয়। প্রতিটি আলোচনা সভাতে ছাত্ররা কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর শপথ নেয়। কর্মসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ, অফিস সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ এবং সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শ্রেয়া সিং।

এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে ছুটছেন প্রার্থী

এক পা নেই। আছে অটুট মনের জোর। সেই জোরে লাঠিতে ভর করে এলাকায় ভোটের প্রচার করছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভা

কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী কালীচরণ এক্কা। কখনও এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছেন দূরের গ্রামে। চাষিপাড়ায় গিয়ে বোঝাচ্ছেন নয়া কৃষি আইনের কুফল।

শুক্রবার দুপুরে চৈত্রের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে মণিপুরের মেঠো রাস্তায় ধরা গেল কালীচরণকে। এক পায়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে চালানো সাইকেল থামালেন। আরও দুটি সাইকেলে তাঁর সঙ্গীরা জানান, দলের আর্থিক বল নেই। তাই হেঁটে ও সাইকেলে যত বেশি এলাকায় পৌঁছনো যায়। গত সোমবার মনোনয়ন দিয়েই প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন কালীচরণ। তপন থানার গোফানগর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রাম হাসাইপুরের বাসিন্দা বছর ৪৯-এর কালীচরণ নিজে ছোট চাষি। বড় মেয়ে পায়েল দশম, মেজ মেয়ে আশ্রিতা অষ্টম ও ছোট ছেলে তেলাবন প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। মাত্র দেড় বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে সংসার চলে না। তার সঙ্গে স্ত্রী খুকিদেবীকেও অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতে হয়। তবে অভাব অনটনের মধ্যেও কালীচরণ পার্টির আদর্শের পথে অটল থাকতে পেরে খুশি। দলের জেলা নেতা নুরুল ইসলাম বলেন, কালীচরণ ছাত্র বয়স থেকে এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে যুক্ত। দলের আদর্শে শিক্ষিত একনিষ্ঠ কর্মী কালীচরণকে আদিবাসী অধ্যুষিত তপন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

কালীচরণ জানান, ১৯৮৩ সালে ফুটবল খেলার সময় ডান পায়ে আঘাত লাগে। সে সময় ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে না পারায় সংক্রমণের ফলে পা কেটে বাদ দিতে হয়। সরকারি দফতর এবং রেড ক্রসে একাধিকবার আবেদন করেও মেলেনি ক্র্যাচ কিংবা হুইলচেয়ার। ফলে সেই কিশোর বয়স থেকে লাঠি নিয়েই চলাফেরা। এলাকার দিনমজুর ও চাষিরা বলেন, কৃষি আইন নিয়ে কিছুই জানা ছিল না। কালীবাবুই এসে বোঝালেন ভবিষ্যতে বণিকরা চুক্তি চাষের জালে ফেলার চেষ্টা করবেন। তিনিই আমাদের বোঝালেন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের এস ইউ সি আই প্রার্থী ইতিমধ্যে প্রচারে নজর কেড়েছেন। কালীচরণ বলেন, 'কৃষি আইন ভয়াবহ। চুক্তি চাষ প্রথার আড়ালে পুঁজিপতিরা কৌশলে দাস প্রথা কায়েমের চেষ্টা করছে। আইন প্রত্যাহার না হলে কৃষকের হাতে জমি থাকবে না। গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে ওই কথা তুলে ধরছি।'

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরবঙ্গ সংস্করণ, ৩.৪.২০২১)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com